সাম্যবাদ বুলেটিন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● পঞ্চম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা) ● জানুয়ারি ২০১৯ ● দুই টাকা

হেফাজতের আমির আহমদ শফির বক্তব্য ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার নিদর্শন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি আল্লামা শফি সাহেব এক ওয়াজ মাহফিলে মেয়েদের স্কুলে না দেয়ার জন্য, আর পড়ালে ও ক্লাস ফোর–ফাইভের বেশি না পড়ানোর জন্য মাহফিলের লোকেদের ওয়াদা করিয়েছেন। তার এই ধরনের বক্তব্য ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার নিদর্শনই শুধু নয়, বাস্তব বিবর্জিতও। দুঃখের বিষয় এই ধরনের বয়ান তারা আজও দিয়ে যাচ্ছেন। আর আওয়ামীলীগ এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের কথায় পাঠ্য পুস্তকের রচনা পাল্টেছে, আবার মুখে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনার গল্পও শোনাচ্ছে।

আল্লামা শফিও ধর্মের নামে মানুষকে ঠকাচ্ছেন। একদিকে নারীশিক্ষাকে হারাম বলছেন, অপরদিকে শেখহাসিনাকে গণসংবর্ধনার মাধ্যমে কওমী জননী উপাধি দিয়েছেন। যখন যেমন কথা বললে সুবিধা হয়,তখন সে রকম কথাই বলে যাচ্ছেন। বাস্তবে তারা ধর্মের কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। এতে মানুষ ন্যায়–অন্যায় কী তাও ঠিক ভাবে ধরতে পারছেনা। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সকল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে এই সকল কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের আহ্বান জানান।

হেফাজত আমিরের নারী শিক্ষা বিরোধী ফতোয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ

অভূতপূর্ব ভোট ডাকাতির নির্বাচন!

জনপ্রতিনিধিত্বহীন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন রুখে দাঁড়ান গণতন্ত্র রক্ষায় ও জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন

সীমাহীন 'ভোট ডাকাতি', কেন্দ্র দখল ও জালভোটের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। পুরো প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গায়ের জোরে কার্যত একটি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় আসল আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে 'ভোটডাকাতি'র অনবদ্য কৌশলের জন্য। প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনসহ রাষ্ট্রের সকল সংস্থাগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে রিগিংয়ের কাজে আর কোন নির্বাচনে এত ব্যাপকভাবে নামানো হয়নি। নির্বাচনের আগের রাতে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমেই একটা বিরাটসংখ্যক ব্যালটে নৌকা মার্কায় সিল মারা হয়েছে। কেন্দ্রে ভোটারদের প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা, মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কথা বলে কিংবা নকল লাইন তৈরি করে বুথগুলোতে ভোট বন্ধ রেখে সিল মারা – এরকম অভিযোগ অসংখ্য। ভোট দিতে গিয়ে সরকারদলীয় কর্মীদের বা পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছে সাধারণ ভোটাররা। গোটা দেশ মানতে না পারার ও অপমানের একটা তীব্র জ্বালার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল ও নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে ৩ জানুয়ারি'১৯ মানববন্ধন-অবস্থান কর্মসূচী

নির্বাচনের খণ্ডচিত্র

ভোটের আগের দিন বিকেল থেকেই একধরনের থমথমে, ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয় দেশে। দোকানপাট বন্ধ করে দেয়া হয়। পুলিশ–মিলিটারির টহল চলে রাস্তা জুড়ে। মানুষ রাস্তা কিংবা পাবলিক স্পট থেকে সরে যায়। পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়েই বিরোধী দলগুলোর প্রচারে বাধা, হামলা, বিরোধী দলের নেতা–কর্মীদের গায়েবি মামলায় জেলে ঢুকানো– ইত্যাদির মাধ্যমে একটা ভয় ও সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল। নির্বাচন হবে কি না, ভোট দিতে পারবে কি না – এ নিয়ে মানুষ একটা সংশয়ের মধ্যে ছিল। সরকারের দায়িত্ব ছিল মানুষের সংশয় দূর করে নির্বাচনের একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। তা না করে সরকার সংশয়, আশঙ্কা ও ভয়কে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলল। নির্বাচনের আগের দিন এটাকে আরও ঘনীভূত করা হল।

ভোটের দিন সকালে অনেক জায়গায়ই ভোট গ্রহণ শুরু হয়, চলে ১০টা–১১টা পর্যন্ত। তারপর কেন্দ্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের দখলে চলে যায়। যেসব কেন্দ্রে সারাদিন ভোট চলেছিল সেসব কেন্দ্রের বুথগুলোতে নকল লাইন তৈরি করা হয়। দেখা গেল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাইন এগোচ্ছে না, আবার লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা কিছু বলছেও না। ভেতরে দরজা বন্ধ করে জাল ভোট দেয়া হয়েছে। কিছু কেন্দ্রে দুপুরের খাবারের জন্য বিরতির কথা বলে ভোট গ্রহণ বন্ধ রেখে ভেতরে জালভোট দেয়া হয়েছে।

বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের আগেই মামলা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। যারা তারপরও পোলিং এজেন্ট হিসেবে ছিলেন তারা জালভোটের প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ হুমকি দিয়েছে। ছবি তুলে রেখে বলেছে, পরে দেখে নেবে। অনেক এজেন্টকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পোলিং বুথ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অনেককে ঢুকতেই দেয়া হয়নি। কেন্দ্র ছিল পুরোপুরি সরকারি দলের নেতা–কর্মীদের দখলে। তারা নৌকা মার্কার গেঞ্জি, মাফলার, ব্যাচ লাগিয়ে সারা কেন্দ্র ঘুরে বেরিয়েছেন। অনেক ভোটারকে তাদের সামনে নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করা হয়েছে, অনেকের হাত চেপে ধরে জোর করে নৌকায় সিল মারানো হয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার ছাড়া সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পোলিং এজেন্টদের কাছ থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই মোবাইল নিয়ে নেয়া হয়েছে, যাতে এসব কর্মকাণ্ডের কোনকিছুর ছবি ও ভিডিও বাইরে না যেতে পারে। ভোট গণনার আগেই পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। এসব কৌশলের বর্ণনা দিতে গেলে পাতার পর পাতা লেখা যাবে। এই নির্বাচনে ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা যা তারা অর্জন করেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও তহবিলের সীমাহীন লুটপাটের মধ্য দিয়ে। ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগসহ মহাজোট সব মিলিয়ে পেয়েছে ২৮৮ আসন, বিএনপি'র ৫টিসহ ঐক্যফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে মাত্র ৭টি আসনে।

রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা একটি দলের পক্ষে কাজ করেছে

এই নির্বাচনের একটি অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে। পুলিশ দলীয় কর্মীর ভূমিকা পালন করেছে, সেনাবাহিনী নীরব থেকে সমর্থন দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালউদ্দিন শেখ হাসিনাকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান, পুলিশপ্রধান, র‍্যাবপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এটা তারা করতে পারেন না। দেশ ও বিদেশের দু'একটি সংবাদমাধ্যম ছাড়া গোটা মিডিয়ায় এই ব্যাপক 'ডাকাতি' চেপে যাওয়া হয়েছে। মানুষ জেনেছেন গুটিকয়েক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহায়তায় আর নিজেদের ও কাছের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। যারা একটু নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে চেয়েছে, তাদের উপর আক্রমণ এসেছে। ঢাকার নবাবগঞ্জে যমুনা টিভি, দৈনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ হয়েছে নির্বাচনের আগেই। যমুনা টিভির সম্প্রচার অঘোষিতভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্টারনেটের গতি ধীর করে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অনেকটা অকার্যকর করে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ নির্বাচনে ভোটডাকাতির অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে না পারে। এসমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রের শক্তিস্তম্ভগুলোর মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে ভেঙে পড়েছে। সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার মধ্য দিয়ে কীভাবে একটা *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জনপ্রতিনিধিত্বহীন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন রুখে দাঁড়ান

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ এখানে কায়েম হয়েছে। গণতন্ত্র আজ নাম বদলে হয়েছে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র', 'উন্নয়নের গণতন্ত্র'।

আওয়ামী লীগ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলছে, কার্যত মুক্তিযুদ্ধকে সে ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এদেশের উন্মেষকালে লক্ষ কোটি মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সেই চেতনার ধারেকাছেও এখন সে নেই। 'এক দেশ দুই অর্থনীতি' বলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়েছিল, অথচ সেই 'এক দেশ, দুই অর্থনীতি' এখনও বিদ্যমান। গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। ষাট-এর দশকে ভোটের অধিকারের জন্য আওয়ামী লীগ লড়েছে, অথচ আজ সে নিজেই জনগণের ভোটাধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করছে। আজ জনগণকে সেই একই দাবি আবার তুলতে হচ্ছে, যে দাবিতে স্বাধীনতার পূর্বে লড়েছিল, জীবন দিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ–বিএনপি–জাতীয় পার্টি–জামাতসহ ধনিকশ্রেণির সরকারগুলো ক্ষমতায় থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হয়নি সত্য, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গদি দখলের কাজে বিক্রি ও ব্যবহার এভাবে আর কোন দল করতে পারেনি।

এর মানে এই নয় যে, এর বদলে বিএনপি–জামাত কিংবা ঐক্যফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলে ভালো হতো। তারা ক্ষমতায় আসলে তাদের উপর আওয়ামী নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া এবং নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার চেষ্টাই তারা করতো। একটু অতীতের দিকে তাকালেই দেখবেন যে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগকে বিরাট ব্যবধানে জনগণ জিতিয়েছিল বিএনপি–জামাত জোট সরকারের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই। অথচ আজ মানুষ তার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। আপনাদের মনে আছে, ১৯৯১ সালে প্রথমবার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৬ সালে একটি একতরফা নির্বাচন করেছিল বিএনপি। কিন্তু সেই সংসদ টিকিয়ে রাখতে পারেনি বিএনপি। ২০০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয়করণ ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির অধীনে নীলনকশার নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টাই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছিল। তারা সেই সময়ে বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে বলপ্রয়োগে ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, যেমনটা এখন আওয়ামী লীগ আরো নৃশংসভাবে করছে। ফলে আওয়ামী লীগ, না হয় বিএনপি – এই করে করে জনগণ বারবার ঠকছেন।

সামরিক স্বৈরাচারের পতনের পর দ্বি–দলীয় পার্লামেন্টারি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

স্বাধীনতার পর প্রথম সংসদ নির্বাচনই ছিল ব্যাপক কারচুপির। '৯০–এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর দেশ একটা নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রধান দুটি দল – আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে কেন্দ্র করেই এই নির্বাচনগুলি আবর্তিত হতে থাকে। মানুষ ভোট দিয়ে একদলকে ক্ষমতায় আনে, তাদের শাসনে ক্ষুব্ধ হয়ে পাঁচ বছর পর আরেক দলকে আনে। আওয়ামী লীগ না হয় বিএনপি – এভাবেই দেশ চলছিল, যদিও এদের মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নেই। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি – এসমস্ত গুরুতর বিষয়ে এই দুই দলের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। দু'দলই পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতি করে, তাদের দলীয় তহবিল ভরে দেয় বড় বড় পুঁজিপতি–শিল্পপতিরা। সাম্রাজ্যবাদের কাছে এই দুই দলই নতজানু। দেশের সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানিগুলোর হাতে পানির দরে তুলে দেয়া, তাদের পরামর্শ অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক নীতি ঠিক করার কাজ দু'দলই করে। ফলে দুই দলের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। এরা পালা করে ক্ষমতায় আসে, কিন্তু দেশের মানুষের এতটুকুও স্বস্তি হয় না। জিনিসপত্র, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবহনের ভাড়া – ইত্যাদি বাড়েই, শুধু মানুষ পাঁচ বছর পর পর একটি দিন তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাই মহামতি লেনিন বলেছিলেন, "বুর্জোয়া পার্লামেন্ট নির্বাচন হচ্ছে কয়েক বছর অন্তর কোন দল বুর্জোয়া শ্রেণির হয়ে শাসন ও অত্যাচার চালাবে তা ঠিক করা।" কারণ দেশের পুঁজিপতি–শিল্পপতিদের স্বার্থেই যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তখন ব্যবস্থাকে না পাল্টে কেবল সরকার পাল্টালে এই সমস্যার কোন সমাধান হয় না, শুধু একদলের উপর ক্ষোভ অন্যদলকে ভোট দিয়ে প্রশমিত করা হয় মাত্র।

এই দ্বি–দলীয় ব্যবস্থা আজ সারাবিশ্বের সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল যখন অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল। অর্থাৎ সামন্ত অর্থনীতি ভেঙে গিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিমালিকরা নিজেদের পণ্য দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে চাইছেন, বাজারে তখন ব্যক্তিমালিকদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছিল। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে রাজনীতি এসেছে, বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব এবং সেটার রূপ হিসেবে পার্লামেন্ট এসেছে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবেই রাজনৈতিক দলগুলো তখন তাদের নিজের বক্তব্য নিয়ে মানুষের কাছে যেত, তাদের বক্তব্যের, রাজনৈতিক কর্মসূচীর যৌক্তিকতা বোঝানোর চেষ্টা করত, মানুষ তাদের বুদ্ধি–বিবেচনা অনুসারে গ্রহণ–বর্জন করত। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির যুগ একসময় শেষ হয়। কিছুসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে বাজারের দখল চলে যায়, অবাধ প্রতিযোগিতার পর্বের সমাপ্তি ঘটে। আসে একচেটিয়া পুঁজিবাদ। তখন উপরিকাঠামোর সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও আর আগের মতো থাকে না।

এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের মুক্তি দূরে থাক, খেয়ে পড়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতেই ব্যর্থ হয়েছে। একের পর এক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবরে পড়ছে, দু'টো বিশ্বযুদ্ধ করেও এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে দেশে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছেই। এই অবস্থায় এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে মানুষের উপর নির্মম নিষ্পেষণ ও তার সকল রকম গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। নির্বাচন বাস্তবে একদিনের জন্য একটি সান্ত্বনামাত্র, কিন্তু আজ সেটিও পুঁজিপতিরা মানুষকে দিতে পারছে না।

আমাদের দেশে '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশ ভারতের মতো নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ই ভারতে একটি শক্তিশালী পুঁজিপতিশ্রেণি গড়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে সেরকম হয়নি। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও দেশের সমস্ত উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো একটি শক্তিশালী পুঁজিপতিশ্রেণি তখনও গড়ে উঠেনি। রাষ্ট্রই তখন কল–কারখানাগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং আস্তে আস্তে সেগুলোকে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণির হাতে তারা অর্পণ করে। ইউরোপের মতো বণিকশ্রেণি থেকে পুঁজিপতিশ্রেণির জন্ম তাই এখানে হয়নি, হয়েছে লুটপাটের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করার মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় এখানে পুঁজিপতিশ্রেণির জন্ম হয়েছে। তাই এখানে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসতেও সময় লেগেছে অনেক। '৯০-এ সামরিক স্বৈরাচারের পতনের পর দেশ একটি পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। বাস্তবে সামরিক স্বৈরাচারের পতনের পর পার্লামেন্টারি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।

ফ্যাসিবাদ এখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আজকের যুগে কোন দেশেই সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। সারাবিশ্বে দ্বি-দলীয় কিংবা একদলীয় কিংবা সামরিক স্বৈরাচার, যেভাবেই হউক না কেন ফ্যাসিবাদ ক্রিয়াশীল। ফ্যাসিবাদ মানে শুধু নির্মম দমন-পীড়নকে বোঝায় না। পুঁজিপতিদের আজ সেটা দিয়ে চলে না। শুধুমাত্র নির্মম দমন-পীড়ন দিয়ে রাষ্ট্র চালানো যায় না। পুঁজিবাদের প্রচণ্ড সংকটকালে ফ্যাসিবাদ এসেছে পুঁজিবাদকে রক্ষার প্রয়োজনে। সে দমন-পীড়ন তো করেই, সাথে সাথে সে মানুষের যুক্তিবোধটাকে মেরে দেয়। সে কিছু জনসমর্থনও আদায় করে, খুব সূক্ষ্ম কৌশলে জনমতকে বিভ্রান্ত করে প্রতারকের বেশে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়। সেজন্য ফ্যাসিবাদ যেকোন ধরনের নগ্ন একনায়কত্ব কিংবা সামরিক একনায়কত্ব থেকেও অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ সেটাকে মানুষ ধরতে পারে, কিন্তু ফ্যাসিবাদকে ধরতে পারে না।

আমাদের দেশে এই ফ্যাসিবাদ কায়েমের যোগ্য পার্টি হিসেবে আওয়ামী লীগ তার দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করছে। উন্নয়নের কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, প্রগতিমনা মানুষকে দেখাচ্ছে জঙ্গিবাদের ভয়, ডাক দিচ্ছে জাতীয় ঐক্যের, আবার ধর্মীয় দল ও গোষ্ঠীসমূহের কাছে পাচ্ছে 'কওমী জননী'র স্বীকৃতি। তার উপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ লোক নির্ভর করে, সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী–সংস্কৃতিকর্মীরা তার বিজয় চায়, কিন্তু সেটা যাতে সংযতভাবে হয় এটা তাদের প্রত্যাশা। এইভাবে আওয়ামী লীগ একটি বিরাট অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যা সহজে অন্য কোন দলের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই ফ্যাসিবাদের আদর্শগত দিকগুলো উন্মোচিত করে তার বিরুদ্ধে লড়াই না করলে শুধু দমন-পীড়ন নিয়ে হা-হুতাশ করে, আওয়ামী লীগকে ফেলে দিয়ে বিএনপিকে আনলে সমস্যার সমাধান হবে না। এই ফ্যাসিবাদ এদেশে আসতে পারল কেন? বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের চর্চা এদেশে প্রায় হয়নি বললে চলে। উপরন্তু ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার প্রসার ঘটেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, ভারতের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন "Fascism is a peculiar fusion between spiritualism and science." অর্থাৎ ফ্যাসিজম অধ্যাত্মবাদের সাথে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই ব্যাপারটা ধরতে না পারলে আমরা বুঝতে পারব না কেন এত এত বুদ্ধিজীবী–শিল্পী–সাংবাদিকরা এই নগ্ন অন্যায় দেখেও তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। সবাই শুধু টাকা কিংবা স্বার্থের জন্য দাঁড়ান এমন নয়। একটা মানবতাবাদী মন আজ যদি সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবমুখী না হয় তাহলে সেই মন অস্তিত্ববাদী, না হয় ফ্যাসিবাদী– এই দুই চরম জায়গায় যেতে বাধ্য।

যে নির্মম শোষণ ও লুটপাটের মধ্য দিয়ে আজকের দিনে পুঁজিপতিশ্রেণি টিকে থাকে, রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-ব্যক্তিস্বাধীনতা-মত প্রকাশের অধিকার এইগুলি বজায় রেখে সেটা করা সম্ভব নয়। আবার এগুলোকে ধ্বংস করার ব্যাপারেও তাদের খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। কারণ এর একটা ঝুঁকি হল এই যে, জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারবঞ্চিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। তাই ফ্যাসিবাদ কায়েমের জন্য একটা দলের দরকার যে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও কেড়ে নিবে, আবার তাদেরকে নিজের কব্জায়ও আটকে রাখতে পারবে।

আওয়ামী লীগ সেই দল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিগ হাউজ, বুরোক্র্যাসি, পুলিশ ও মিলিটারি একযোগে তাকে চাইছে। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণিও তাকে চাইছে। যতদিন আওয়ামী লীগ এই সেবা দিতে পারবে, ততদিন এই শ্রেণি তাকে সমর্থন দিয়ে যাবে। পুঁজিপতি শ্রেণি দল পরিবর্তনের চিন্তা করে দুটি কারণে। এক, সেই দল যদি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ না করতে পারে। দুই, যদি জনবিক্ষোভ ও অসন্তোষ এমন মাত্রায় পৌঁছে যে সে দল ক্ষমতায় রাখলে গণঅভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অর্থাৎ দমন ও বিভ্রান্তি, এই দুই-ই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি এই কাজ করতে পারলে আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি টানা তিনবার ক্ষমতায় আসত। সেটা সম্ভব হয়নি বলেই ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখোশ পড়ে মিলিটারি শাসন এসেছিল। কারণ ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে তারেক রহমানের নেতৃত্বে হাওয়া ভবনে একটি সমান্তরাল প্রশাসন সৃষ্টি হয়েছিল। তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ মাফিয়া ব্যবস্থাটি ব্যবসায়ী শ্রেণীর একাংশ, সিভিল বুরোক্র্যাসি ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে বিএনপি'র পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণতন্ত্র রক্ষায় ও জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলন গড়ে তুলুন

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন) আজ যদি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে জনবিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে, কোনরকম বিভ্রান্তি, প্রতারণা ও গায়ের জোরে তাকে যদি রক্ষা করা না যায় – তাহলে তাকে পাল্টে আবার বিএনপিকে আনবে, কিংবা রাতারাতি নতুন একটা শক্তির জন্ম দেবে ও তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে মানুষের সামনে নিয়ে আসবে। একথা আমাদের স্পষ্ট বুঝে রাখা দরকার, যে-ই পুঁজিপতিশ্রেণিকে সর্বোচ্চ সেবা দেবে ও এই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে তাকেই তারা ক্ষমতায় রাখবে। এজন্য পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার ঠাঁটবাটও তাদের বজায় রাখার দরকার নেই।

এ প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়, "বিশ্বব্যাপী অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ যখন গড়ে উঠছিল, সেই বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের রাজনৈতিক উপরিতল হিসেবে গড়ে উঠেছিল প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। তখন বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা ও ব্যক্তিঅধিকারের চিন্তাচেতনাকেই তুলে ধরেছে। কিন্তু বিশ্বপুঁজিবাদের সাধারণ সংকট যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, লগ্নী পুঁজি বা সাম্রাজ্যবাদের এই স্তরে এসে আজ আর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিঅধিকার সম্পর্কে পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের আগ্রহ দেখায় না বরং তারা বেশি বেশি করে এখন সামরিকীকরণ ও আমলাতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকছে। . . .বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে এমনকি পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রূপেই ফ্যাসীবাদ আজ আত্মপ্রকাশ করছে। বিশেষভাবে এই আত্মপ্রকাশ ঘটছে কি উন্নত কি আপেক্ষিক অর্থে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে।"

ভারতীয় পুঁজিপতিরা উল্লসিত

শেখ হাসিনার বিজয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণি উল্লসিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছে তার দল বিজেপি। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার প্রশস্তি গাওয়া শুরু হয়েছে। ভারত তার প্রভাবে থাকা প্রতিবেশী দেশগুলো নিয়ে এখন খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এমনকি ভুটানও তার হাতছাড়া হতে চলেছে। বাংলাদেশকে সে তাই কোনভাবেই তার প্রভাবের বাইরে যেতে দিতে চায় না। তাছাড়া ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণিও শেখ হাসিনাকে তাদের বিশ্বস্ত মনে করে করে। ফলে দু'দেশের পুঁজিপতিশ্রেণির বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসলো।

গণআন্দোলন ও শ্রেণিআন্দোলন ছাড়া কোন মুক্তি নেই

ফলে দেশে এখন একমাত্র রাজনৈতিক বিকল্প বাম গণতান্ত্রিক জোট। এ জোট তার সীমিত শক্তি নিয়েও আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এসেছে এবং তার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। নির্বাচনের পূর্বে নিরপেক্ষ সরকার গঠন, পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করাসহ চার দফা দাবি বাম গণতান্ত্রিক জোট তুলেছিল। এই জোট শক্তিশালী হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হবে। আমাদের দল বাসদ(মার্কসবাদী) জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা করা ও দেশের কৃষক–শ্রমিক–ছাত্রসমাজ–পেশাজীবীসহ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সংকটগুলোকে তুলে ধরে ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কেবল ক্ষমতা দখলের আন্দোলন মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। জনগণের বিভিন্ন দাবিকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। এজন্য বামজোটকেই শক্তিশালী করতে হবে। দেশের গণতন্ত্র ও প্রগতিমনা, শিক্ষিত, সচেতন নাগরিকবৃন্দ, কৃষক–শ্রমিক–পেশাজীবী, ছাত্র ও যুবসমাজ – সবাইকে আমরা জনগণের অধিকার আদায়ে এবং ভোটাধিকারসহ গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

নির্বাচন জনগণের মুক্তি আনতে পারে না। আজ যে নির্বাচনকে আমরা তুলনামূলক অর্থে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি অর্থাৎ '৯১, '৯৬, '০১ ও '০৮ এর নির্বাচন– সেগুলোও বাস্তবে টাকা, পেশীশক্তি ও মিডিয়ার খেলা। এছাড়া কোন নির্বাচন হয় না। ফলে নির্বাচন আজ একটা উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই নির্বাচন দিয়ে মানুষের জীবনের মৌলিক কোন পরিবর্তন আসবে না। এজন্য চাই মানুষের দৈনন্দিন সংকট–সমস্যাগুলোকে নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন। হঠাৎ জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যাওয়া আন্দোলন নয়, গণকমিটি–সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এলাকায় এলাকায় আন্দোলনের স্থায়ী সংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই গণআন্দোলন বিস্তৃত হবে। এই ধরনের স্থায়ী সংগঠন সৃষ্টি না করতে পারলে সকল বিক্ষোভ–আন্দোলনকে এক সুতায় গাঁথা যাবে না। আন্দোলনগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। বিভিন্ন ইস্যুতে এই গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের সঠিক রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা আমাদের আশু কর্তব্য। তাই দেশের জনগণকে আমরা বলতে চাই, সারাদেশে যেভাবে বিরোধী মতকে দমন করা হচ্ছে, বাক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে, গ্যাস–বিদ্যুৎ–নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে জীবনযাপনকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নারীদের অসম্মান-নিপীড়ন-ধর্ষণ-নির্যাতন করা হচ্ছে – এই সবগুলো বিষয় নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসুন, এ ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন রাস্তা নেই।

দিনভর গণশুনানীতে বাম জোটের প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা
'ভোট ডাকাতি' বললে খুব কমই বলা হবে
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসের কাছে পরাস্ত জনগণের ভোটাধিকার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচন পরবর্তী নানা ধরনের অনিয়ম, অভিজ্ঞতা ও সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলী শোনার জন্য ১১ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত গণশুনানী করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। গণশুনানীতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ৮২ জন প্রার্থী তাদের অভিজ্ঞতা ও ভোটের চিত্র তুলে ধরেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে ৮২ জন প্রার্থী একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট ডাকাতি, জবর দখল ও অনিয়মের সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরেন। এসময় সকলের কণ্ঠেই একথা প্রতিধ্বনিত হয় যে, কোটি কোটি মানুষকে ভোটাধিকার বঞ্চিত করে যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তা মোটেই জনমতের প্রতিফলন নয়। তারা বলেন, এই নির্বাচনকে 'ভোট ডাকাতি' বললে খুব কমই বলা হবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসের কাছে পরাস্ত জনগণের ভোটাধিকার। তাঁরা জনগণের ভোটাধিকার অর্জনের সংগ্রামে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

গণশুনানীর সমাপনী বক্তব্যে মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন নিয়ে বহু অভিযোগ আছে, এটি নজিরবিহীন একটি ভুয়া ভোটের নির্বাচন। তিনি বলেন, গণশুনানীর এসব বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে আমরা আমাদের করণীয় নির্ধারণ করব। তিনি বলেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, সংসদ বাতিল করে দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বামপন্থিরা রাজপথে থেকেই লড়াইকে এগিয়ে নিবে। তিনি এই লড়াইয়ে দেশবাসীকে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের দাবি

গণশুনানীতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক। গণশুনানীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

গণশুনানীতে প্রার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দিনাজপুরের রেয়াজুল ইসলাম রাজু, নীলফামারীর ইউনুস আলী, লালমনিরহাটের আনোয়ার বাবুল, রংপুরের অধ্যাপক কামরুজ্জামান, সাদেক হোসেন, মমিনুল ইসলাম, কুড়িগ্রামের উপেন্দ্র নাথ রায়, আবুল বাসার মঞ্জু, গাইবান্ধার মিহির ঘোষ, গোলাম রাব্বানী, শামিউল আলম রাসু, জয়পুরহাটের অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, বগুড়ার আমিনুল ফরিদ, সন্তোষ পাল, রঞ্জন দে, লিয়াকত আলী, নওগাঁর ডা. ফজলুর রহমান, রাজশাহীর এনামুল হক, আলফাজ হোসেন যুবরাজ, সিরাজগঞ্জের নবকুমার কর্মকার, মোস্তফা নূরুল আমীন, আব্দুল আলিম, কুষ্টিয়ার শফিউর রহমান শফি, ঝিনাইদহের অ্যাড. আসাদুর রহমান, বাগেরহাটের খান সেকান্দার আলী, শরিফুজ্জামান শরিফ, খুলনার এইচ এম শাহাদাত, জনার্দন দত্ত নান্টু, সাতক্ষীরার আজিজুর রহমান, পটুয়াখালীর মোতালেব মোল্লা, জহিরুল ইসলাম সবুজ, বরিশালের আব্দুস সাত্তার, পিরোজপুরের ডা. তপন বসু, দিলীপ পাইক, টাঙ্গাইলের জাহিদ হোসেন খান, জামালপুরের আলী আক্কাস, ময়মনসিংহের অ্যাড. এমদাদুল হক মিল্লাত, হারুন আল বারী, নেত্রকোনার মোস্তাক আহমেদ, জলি তালুকদার, সজিব সরকার রতন, কিশোরগঞ্জের ডা. এনামুল হক ইদ্রিস, ডা. খন্দকার মোসলেউদ্দিন, মানিকগঞ্জের রফিকুল ইসলাম অভি, ঢাকার আবু তাহের হোসেন (বকুল), খালেকুজ্জামান লিপন, সম্পা বসু, জোনায়েদ সাকি, আহসান হাবীব লাবলু, রিয়াজ উদ্দিন, ডা. সাজেদুল হক রুবেল, নাঈমা খালেদ মনিকা, আহসান হবীব বুলবুল, গাজীপুরের রাহাত আহমেদ, মফিজ উদ্দিন আহমেদ, মানবেন্দ্র দেব, নরসিংদীর কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, নারায়ণগঞ্জের আব্দুস সালাম বাবুল, আবু নাঈম বিপ্লব, ফরিদপুরের রফিকুজ্জামান লায়েক, গোপালগঞ্জের ইসহাক মোল্লা, সুনামগঞ্জের নিরঞ্জন দাস খোকন, সিলেটের প্রণব জ্যোতি পাল, মৌলভীবাজারের প্রসান্ত দেব সানা, মইনুর রহমান মগনু, হবিগঞ্জের পিযুষ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহরিয়ার মোহাম্মদ ফিরোজ, কুমিল্লার আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, চাঁদপুরের শাহজাহান তালুকদার, ফেনীর জসিম উদ্দিন, হারাধন চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের হাসান মারুফ রুমি, অপু দাশ গুপ্ত, রাঙ্গামাটির জুই চাকমা প্রমুখ।

মজুরি বৃদ্ধির নামে গার্মেন্টস মালিক ও সরকারের প্রতারণা উল্টো শ্রমিকদের ওপর গুলি-নির্যাতন-গ্রেপ্তার-ছাঁটাই

বছরের শুরুতেই রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ' সকালের সূর্য দেখেই নাকি বলা যায় সারাদিন কেমন যাবে।' তেমনি আওয়ামী লীগ সরকার আবার 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন' বা ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর আগামী দিনগুলো এদেশের মানুষের কেমন যাবে তারই পূর্বাভাস হলো এই ঘটনা। নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরপরই একদিকে গার্মেন্টস মালিকদের রপ্তানিতে উৎসে কর দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ২৫ শতাংশ করা হলো। অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকের উপর গুলিতে শ্রমিক হত্যা হলো। এই দুই ঘটনা এই বার্তাই দিয়ে গেলো, সরকার কার পক্ষে – মালিক না শ্রমিকের?

গত ৮ জানুয়ারি সাভারে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে সুমন মিয়া নামে এক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছে। শুধু সাভার আশুলিয়া নয়, এই বিক্ষোভ ছড়িয়েছে গাজীপুর, উত্তরা, মিরপুর ও নারায়ণগঞ্জের প্রায় সমস্ত কারখানাতেই। সরকার শ্রমিকের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে পুলিশ-বিজিবি লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করছে। শত শত শ্রমিক ইতোমধ্যে আহত হয়েছে। আর মালিক পক্ষ বরাবরের মতোই 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' নিয়ে ব্যস্ত। আর ষড়যন্ত্র যদি হয়ই তা করছেন মালিকরাই। ন্যায্য আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র করছেন। হামলা-মামলা, দমন-পীড়ন, জীবনের নিরাপত্তাহীনতায়ও পুলিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কেন আজ শ্রমিকরা রাস্তায়?

ঘটনার সূত্রপাত নতুন মজুরি কাঠামোর পর থেকে। গত ২৫ নভেম্বর পোশাকশিল্পের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে শ্রম মন্ত্রণালয়। তাতে সর্বনিম্ন সপ্তম গ্রেডে নতুন শ্রমিক বা হেলপারের মোট মজুরি ২ হাজার ৭০০ টাকা বাড়লেও দক্ষ শ্রমিক বা অপারেটরদের বেতন বাড়েনি। বা দু'একটি গ্রেডে যৎসামান্য বাড়লেও ক্ষেত্রবিশেষে মূল মজুরি কমেছেও। ২০১৩ সালের মজুরিকাঠামোতে তিন নম্বর গ্রেড বা সিনিয়র অপারেটর পদের মূল মজুরি ছিল ৪ হাজার ৭৫ টাকা। প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট হওয়ায় গ্রেডটিতে কর্মরত পুরোনো শ্রমিকের মূল মজুরি বেড়ে চলতি বছর ৫ হাজার ২০৪ টাকা হতো। অথচ নতুন কাঠামোতে এই গ্রেডের মূল মজুরি করা হয়েছে ৫ হাজার ১৬০ টাকা। অর্থাৎ নতুন কাঠামোতে মজুরি কমে গেছে ৪৪ টাকা। একইভাবে চার নম্বর গ্রেড বা অপারেটর পদের মূল মজুরি বেড়েছে মাত্র ৭৯ টাকা ও পাঁচ নম্বর গ্রেডের বেড়েছে মাত্র ১৬৪ টাকা।

দীর্ঘ পাঁচবছর পর নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষিত হলেও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত না হওয়াতেই শ্রমিকদের ক্ষোভের স্ফূরণ ঘটেছে। আন্দোলনের চাপে ১৩ জানুয়ারি পর্যালোচনা কমিটি সমন্বিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে। ঘোষিত কাঠামোতে দেখা যায়, সংশোধনে যে তিনটি গ্রেড নিয়ে শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল – সেই ৩, ৪ ও ৫ নম্বর গ্রেডে ডিসেম্বরের গেজেটের তুলনায় বেতন বেড়েছে যথাক্রমে ২০, ১০২ ও ২৫৫ টাকা। এছাড়া ষষ্ঠ গ্রেডে ডিসেম্বরের গেজেটের তুলনায় ১৫ টাকা মাত্র বেতন বেড়েছে। এই বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা শ্রমিকদের সাথে প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়!

শ্রমিকদের মজুরি না বাড়লেও, বাড়ছে মালিকদের রপ্তানি আয়

মজুরি বৃদ্ধির দাবি উঠলেই গার্মেন্টস মালিকরা লোকসানের গল্প ফেঁদে বসেন। প্রকৃত সত্য তার উল্টো। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-র তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের (২০১৮-১৯) প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। এই সময়ে আয় হয়েছে প্রায় ১হাজার ৩৬৫ কোটি ডলার। আর সর্বশেষ অক্টোবর মাসে রপ্তানি আয় প্রায় ৩১ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছরের প্রথম ৯ মাসে রপ্তানি বেড়েছে আগের বছরের চেয়ে ৫.৮৪ শতাংশ। এই রপ্তানি আয় ক্রমবর্ধমান। মালিকদের আয় ক্রমবর্ধমান হলেও শ্রমিকদের জীবনের অবস্থা কী?

কেমন করে বেঁচে আছে শ্রমিকরা

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে 'কী করে বাঁচে শ্রমিক' নামক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: "৬১ শতাংশ শ্রমিক মনে করেন, তাঁর আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি।...অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা সামাল দেওয়ার জন্য শ্রমিকেরা নিয়মিত ঋণ নেন এবং খাদ্য ও বাসাভাড়া বাবদ ব্যয় কমিয়ে দেন। গড়ে একজন পোশাকশ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের পাশাপাশি মাসে গড়ে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত ওভারটাইম করেন। ফলে শ্রমিকেরা প্রয়োজনীয় ঘুম ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হন..."। এই ঢাকা শহরে জীবনযাপনের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। সাধারণ একটি বাসা ভাড়া নিতে গেলেও গুণতে হয় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এলাকাভেদে যা আরো বেশিও হয়। যেখানে একজন শ্রমিকের মাসিক আয়ই ৭-৮ হাজার টাকা। ফলে বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা ঠাঁই নেয় শহরের বস্তিগুলোতে। অন্ধকার ঘর। দরজা দিয়ে কোনোরকমে প্রবেশ করলেও জানালা নেই – আলো-বাতাসহীন, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, ময়লা- নোংরা আবর্জনা আর দুর্গন্ধময় বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়াই ভার – এই রকম পরিবেশে একজন শ্রমিকের দিন কাটে। দিনের আলো ভালো করে ফোটার আগেই ছুটতে হয় কারখানায়, সন্ধ্যে হলেও ছুটি মেলে না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে – অন্ধকারে বাড়ি ফেরে ওরা। কখনো জোর করে রাত ১০টা-১২টা পর্যন্ত খাটিয়ে নেয়। কাজের রেট বাড়িয়ে দিয়ে বাড়তি কাজ আদায় করে। অকথ্য গালাগাল-নির্যাতন তো বোনাস। শত অপমান সয়েও শুধু বাঁচার তাগিদে, দু'মুঠো ভাতে জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয় শ্রমিকদের জীবন। বেঁচেবর্তে থাকার এই সরু গলিপথটাও যখন অবরুদ্ধ তখনই শ্রমিকরা জীবনের তাগিদে নেমে এসেছে রাস্তায়। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে বাঁচার মতো মজুরি, মনুষ্যোচিত জীবনের জন্য ন্যায্য মজুরির দাবি তুলেছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নির্মিত হবে আগামীর পথ।

গৃহবধূকে গণধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ

৩০ ডিসেম্বরের ভোট ডাকাতির নির্বাচন প্রত্যাখান ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নৌকা মার্কায় ভোট না দেওয়ায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মিছিলটি বেলা সাড়ে ১২ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রদক্ষিণ করে কলা ভবনের সামনে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ- সভাপতি ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য ও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। বক্তারা বলেন," আওয়ামী

সরকার দমন- পীড়ন করে জনগণের অধিকারকে হরণ করছে। সর্বশেষ ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে।" বক্তারা আরও বলেন, "আওয়ামী নেতা-কর্মীদের দ্বারা যে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষকে উদ্বিগ্ন করেছে। এটি রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয়েছে। তাই এর দায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও সরকার এড়াতে পারে না।"

বক্তারা এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের আহ্বান জানান।

নৌকা মার্কায় ভোট না দেওয়ায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ সমাবেশ

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org